যাদের কথা মনে গাঁথা

মিজানুর রহমান তরুণ

পুর্বের সংখ্যার পর – – – (আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন)

সূর্য যখন আমাদের আলো দিতে উঠতো, আমিও তখন বিছানা ছেড়ে উঠতাম। মন চাইতো না, তবুও উঠতাম। ‘‘মা’’ অনেক আগেই, সেই ফজরের ওয়াক্তে, মাথায় হাত বুলিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে গেছেন। প্রকৃতির কর্ম সেরে, হাতমুখ ধুয়ে, কড়কড়ে অথবা পান্তা ভাত খেয়ে রওনা হোয়ে যেতাম দুলাভাই শিক্ষক কাদের বক্স মহাশয়ের বাসার উদ্দেশ্যে। দু’মাইল পথ। সময় সময় প্রতিকূল আবহাওয়া। প্রাইভেট পড়া, স্কুল শেষে ‘‘মা’’-এর দেওয়া এক টাকায় সংসারের প্রাত্যহিক বাজার সেরে বাড়ি ফেরা। এই ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

তখনকার দিনে শীতের কাপড় বলতে গায়ে সূতির চাদর, পায়ে বাটা কোম্পানীর সাদা কাপড়ের জুতা (কেড্‌স্‌), গরমে মোটরগাড়ীর টায়ার কাটা স্যান্ডেল, বর্ষায় বহু মেরামতি কাঠের হ্যান্ডেলের কালো রঙের ছাতা।

আব্বার জীবদ্দশায় আমাদের ভাইবোনদের জন্য বরাদ্দ ছিল বছরে সাধারণ মানের দু’জোড়া করে শার্ট-প্যান্ট বা সালোয়ার-কামিজ, ঈদে নতুন সাদা পাঞ্জাবী-টুপি, স্কুলের জন্য একজোড়া আলাদা। আব্বা মনে করতেন, দামী পরিধান মানুষের মনে অহংকারী ভাব এনে দেয় এবং মানুষের অহংকার করার কোনো অবকাশ নেই।

আব্বাবিহীন সংসারে, আমি কৈশোরে, সংসারের কিছু দায়িত্ব পাওয়াতে, জীবনকে খু-উ-ব কাছ থেকে দেখতে পেলাম। এখনকার মতো তখন অতো মিডিয়া ছিল না। অতি উৎসাহী বড়দের দু’চারজনকে খবরের কাগজ পড়তে দেখেছি। শহরের দু’চারজনের বাড়ীতে বিদ্যুৎ চালিত মারফি রেডিও আছে বলে শুনেছি। তাই আমার দেখার গন্ডি ছিল আমার পাড়া, আমার প্রতিবেশী, আমার স্কুল, সর্বোপরি জেলা শহরের চেনা কিছু স্থান, মুখচেনা কিছু মানুষ ও আত্মীয়-স্বজন।

খবরের কাগজ পড়ার অধিকার তখনও পাইনি, ওটা বড়দের দখলে– ছোটদের জন্য শুধু পাঠ্যপুস্তক। মায়ের সংগৃহীত সাপ্তাহিক ‘‘বেগম’’ পত্রিকা চুপিচুপি পড়ে পত্র-পত্রিকার প্রতি আগ্রহ জন্মে গেল। জেলা শহরে তখন একটি মাত্র পত্রিকার দোকান– তাও খোলে বিকেল চারটায়, বন্ধ হয় সন্ধ্যা ছ’টায়। অনেককে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজের সৌজন্য কপি ভাগাভাগি করে পড়তে দেখেছি। আমিও একদিন ঐ ‘ভাগাভাগি দল’-এর সদস্য হয়ে গেলাম। নেশা পেয়ে বসলো পত্র-পত্রিকার প্রতি। চেতনায় স্থান করে নিল ভাষা, দেশ ও রাজনীতি।

ক্রিকেট প্র্যাক্‌টিস্‌ মাঠে সিনিয়রদের বলতে শুনেছি, থানা পাড়ায় গদা বাবুর বাড়ীতে যাবে, ফিরোজ শাহ্‌ কোটলায় (স্টেডিয়ামে) অথবা কোলকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেটের ধারা বিবরনী শুনতে। আমরা কয়েকজন ছোট, বড়দের পিছু নিয়ে, জানালার ফাঁক-ফোকরে কান দিয়ে

শত শত মাইল দূর থেকে ভেসে আসা কথা ও গান শুনেছি এবং বড়দের ধমক খেয়ে ফিরে এসেছি। এই ছিল আমাদের মিডিয়া জগৎ।

কৈশোরে যেখানে আমার বিচরণের সীমাবদ্ধতা থাকার কথা, সেখানে পিতৃহীন সংসারের কিছু দায়িত্ব এসে পড়াতে আমার চলাচলের গন্ডির কোনো সীমা ছিল না। তখন হতেই খুউব কাছ থেকে দেখতে পেলাম পাড়া-প্রতিবেশীকে, গ্রামবাসীকে, শহরবাসীকে। দেখলাম, অনুভব করতে শিখলাম তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, অভাব, হতাশা, হাহাকার, রোগ-বালা-মুসিবৎ। মানুষের মাঝে মিশে গেলাম। আর এই মিশে যাওয়ার যে কি আনন্দ, তা যে গিয়েছে, সে-ই বোঝে। ভাব বা ভাষায় তা বোঝানো যায় না। ১৯৮৬ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ মহাদেশে যখন বসবাস করতে এলাম, সেই মিশে যাওয়ারই চেষ্টা করেছি। দেখলাম, আমাদের সমাজে অনেক 'ধনী লোক' আছেন, কিন্তু 'বড় লোক' নেই। সম্পত্তি, বাড়ী-গাড়ী আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের পেছনে ছুটে চলেছেন। নাম ফুটানোর জন্য একে ওকে ধাক্কা মেরে নেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন— একেবারে দেশের আদলে।

পুরনো ফটো–এ্যালবাম থেকে খুঁজে নেয়া একটি ছবিতে, (বাঁ থেকে) সামনের সারিতে ১ম ও ২য় বর্তমান সিডনীর আওয়ামী লীগ নেতা ডঃ মোহাম্মদ আলী দম্পতি, ৩য় লেখক, ৫ম মহুয়া হক, ৬ষ্ঠ ওয়ালিউর রহমান টুনু, সর্বডানে পার্থবাসী ডঃ আতিকুর রহমান, পেছন ডানে বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও বহুল আলোচিত সিডনীর বৈশাখী মেলার জন্মদাতা গাজি রুহুল হক এবং তার ডানে কাজী। ২০/০৮/৮৮

কিন্তু 'ম'-এ আকার 'মা', দন্ত্য 'ন'-এ হ্রস্ব উ 'নু' ও মূর্ধন্য 'ষ'-তে যে শব্দটি দাঁড়ায়- তার থেকে অ-নে-ক দূরে আমরা। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এখন আমরা পরীক্ষিত ঐ অনুল্লিখিতদের সমাজেই বসবাস করছি। অভিজ্ঞতা থেকে বলছিঃ ধনী ও গরীব হল ''তেল আর জল''— মেশেও না, মিশে যাওয়াও যায় না।

পাড়া-প্রতিবেশীর উঠোন পেরিয়ে যখন বারান্দার পিঁড়িতে বসার অধিকার পেলাম, তখন জানতে

পারলাম কতো দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা নিয়ে মানুষ বাড়ীর অন্দরে থাকে। বাইরে থেকে তার কিছুই অবলোকিত হয় না। ভরা সন্ধ্যায় হ্যারিকেনের আলোতে আমাদের কয়েক ভাইবোন লেখাপড়ায় ব্যস্ত, পাড়ার মধ্যবয়সী চার সন্তানের জনক আজগর ভাই রিক্সাচালক আসতেন। মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে ‘‘মা’’-কে ‘চাচীমা চাচীমা’ বলে কাতর স্বরে ডাকতেন। ‘‘মা’’ বুঝতে পারতেন। একটি ছোট ডালায় কিছু চাউল ও তরকারী এগিয়ে দিতেন। আজগর ভাই বলেই চলতেন, ‘‘চাচীমা, একটু ডাল আর কাঁচামরিচও দিয়ে দেবেন।’’ যাবার সময় আরো বলতেন, ‘‘কাল ভাল খ্যাপ পেলে ফেরৎ দিয়ে যাব।’’ ‘‘মা’’ বলতেন, ‘‘যখন তোমার সুবিধা হয়, তখন দিও।’’ আজগর ভাইকে কখনো কিছু ফেরৎ নিয়ে আসতে দেখিনি। ঐ আজগর ভাইকে দেখতাম, মধ্য রাত্রে মুমূর্ষু ও দুস্থ রুগীকে ইমার্জেন্‌সি সার্ভিস দিতে।

আমাদের পাড়ার এক কৃষক পরিবারের বৈঠকখানার এক কোণে পড়ে থাকতো বৌ-সন্তান ছেড়ে চলে যাওয়া রজব ঘরামী। ভাত-কাপড়ের অভাবে বৌ বাপের বাড়ী চলে যাওয়ার পর থেকে পাগলপ্রায় রজব ঘরামী কাজ প্রায় পেতই না বা কেউ দিত না। কিন্তু প্রায়ই একটি মাটির হাঁড়িতে মুরগীর মাংশ লবন দিয়ে সেদ্ধ করে খেত। পরে জেনেছি, বাজার থেকে ব্যাপারিদের ফেলে দেওয়া মরা মুরগী কুড়িয়ে এনে ঐ ভোজের আয়োজন। ঐ মৃত মুরগী রজব ঘরামী জবাইও করতো। পড়তো তার নিজস্ব ‘মন্ত্র’ঃ

‘‘বিস্‌মিল্লাহ্‌র বেচরী,
আবদুল্লাহ্‌র মা-র খিচুড়ী
লোকমানের মা-র ডাল,
খাস তোরা কাল।’’

আমরা ছোটোরা তার ঐ কান্ড দেখে মজা পেতাম, এখন দুঃখ অনুভূত হয়। আমাদের শুনিয়ে জোরে জোরে সে বলতো তার মন্ত্র। রজব ঘরামীর বৌটি ছিল ভাল, সুশ্রী। দু’জনার মধ্যে ভাব-ভালবাসাও ছিল। চার বছরের পুত্রসন্তান ‘‘আবদুল’’ ছিল তাদের, কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

যাঁদের কথা মনে গাঁথা। কার কথা ছেড়ে লিখি কার কথা! যাঁদের আশেপাশে থেকে, বসে, ঘোরাঘুরি করে , কথা শুনে, বলাবলি করে জীবনকে চিনতে শিখেছি, তাঁরা সবাই ভাল ছিলেন। এখন সমাজে যেমন যত্র-তত্র ভিলেনের বসবাস, সে সময় তা ছিল না বললেই চলে। ছিনতাই, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস, ধর্ষন, দুর্নীতি, বনখেকো, নদীখেকো, ভূমিদস্যু, ইভটিজিং- এসব শব্দের সঙ্গে পরিচিত হলাম, বিশ্বকে যখন ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ বলে অভিহিত করা হল।

আমাদের পাড়ায় এক ছিঁচকে চোর ছিল। নিশিরাত্রে পাড়াময় ঘুরে ঘুরে, ঘরের বাইরে ভুল করে রাখা কোনো কাঁসা-পিতলের বাসন-কোসন পেলে সে নিয়ে, বেচে মেথর পাড়ায় বসে তাড়ি খেত। আমাদের পাড়ায় জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও কবি বন্দে আলী মিঞা ওর নাম দিয়েছিলেন ‘‘নিশাচর’’। নামটি এর-ওর মুখে ঘোরাঘুরি করতে করতে স্থায়ী হোয়ে গেল ‘‘নিশেচোর’’। নিশেচোরের আসল নাম ওর গর্ভধারিনী ‘‘মা’’-ও ভুলে গিয়েছিল। চোর বলতো না,

তবে ‘‘নিশে’’ বলে ডাকতো। নিশেচোরের মা যুক্তি দেখাতো– ‘‘আমার নিশে কারো ঘরে সিঁদ কেটে বা জানালা ভেঙ্গে চুরি করে না। যা পড়ে পায়, তাই নেয়।’’ তবে নিশেচোর পরোক্ষভাবে আমাদের পাড়ায় পাহারাদারের কাজটিও করতো। বেশী রাতে ওকে ছাড়া আর কাউকে রাস্তায় দেখলে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিত। নিশেচোরের জন্য বহিরাগত কোনো চোর আমাদের পাড়ায় ঢুকতে পারেনি। আমাদের পাড়ায় চুরি ও পাহারার এক অলিখিত দায়িত্ব একমাত্র ওরই ছিল।

গেঁদা দোকানদারের মুদি দোকান ছিল আমাদের অত্র এলাকার ভাঁড়ারখানা। দিন মজুর, স্বল্প আয়কারী ও গরীব দুঃখীদের পয়সা ছাড়া নিত্যদিনের পণ্যক্রয়ের সুপার ষ্টোর। মাল নিয়ে যাও, যখন হয় পয়সা দিও। পহেলা বৈশাখে হত হালখাতা। ভাড়া করা কলের গানে গান শোনো, গরম জিলাপী, চা-পান-বিড়ি খাও, কিছু টাকা জমা দিয়ে নতুন হিসেব খোলো। নতুন বছর শুরু হত নিশ্চিন্তে। দু’চার গ্রাম মিলে বাকী খেত। গেঁদা চাচার দোকানে পহেলা বৈশাখে জমে যেত মানুষের মেলা।

কার বাড়ীতে কাল চুলা জ্বলেনি, সে খবর তিনি কেমন করে পেতেন জানিনা। গেঁদা চাচা ডালায় করে চাল-ডাল-তেল-নুন নিজ হাতে সে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন বলে সবাই বলাবলি করতো, কিন্তু কেউ স্বচক্ষে দেখেনি। আর উনার দোকানের চেগারের মাচা ছিল দু’চার পাড়ার সালিশী বৈঠকখানা। স্বামী-স্ত্রী কলহ হলে পাড়ার স্ত্রীরা বলেই বসতো, ‘‘আমি গেঁদা চাচার কাছে বিচার চাইব’’, তখন সব শান্ত। গেঁদা চাচা ছিলেন শ্রদ্ধা, ভয় ও ভালবাসার এক মূর্ত প্রতীক।

আনোয়ার হোসেন। পাড়ার লোকে ডাকতো ‘‘আনার’’ বলে। ছোটদের কাছে ছিল প্রিয় ‘‘আনার ভাই’’। হা-ডু-ডু, গুলতান্না (ডাংগুলি), সড়কের পাশের খালে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরার সঙ্গী। আমাদের পাড়ার কিশোরদের বয়সের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বড়, তবু সে ছিল আমাদের প্রিয় বন্ধু। পাড়ার সব ছোটদের বাড়ীর বাইরে দেখাশোনার সার্বিক দায়িত্ব প্রকৃতি যেন তাঁকেই দিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ‘আনার ভাই’ থাকলে বাবা-মায়েরা থাকতেন নিশ্চিন্ত। আনার ভাইয়ের স্ত্রী কুলসুম। নিরক্ষর গ্রাম্যবালা যে সবার আপন হোয়ে যেতে পারে, তা সে আনার ভাইয়ের স্ত্রী ‘কুলসুম’। পাড়ার ছোটরা ডাকতাম ‘কুলসুম ভাবী’ বলে। ঐটি হোয়ে গেল তার ট্রেড মার্ক। বয়োজ্যেষ্ঠরাও হাসতে হাসতে ডাকতেন ‘কুলসুম ভাবী’ বলে। প্রায় সব কাজে পারদর্শিনী ‘কুলসুম ভাবী’। পাড়ার সব বাড়ীর অন্দর-মহলের মা-বোনদের এটা ওটা করে দেওয়াই ছিল তার একমাত্র কাজ। আমাদের ছোটদের জন্য খাগড়াই, বাতাসা, লেবেঞ্চুস তাঁর আঁচলে বাঁধাই থাকতো।

আমার ছোট ভাই ‘‘হাফিজুর রহমান বুলগানীন’’। কিছু না পেয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেছে। তাকে যেন আমরা কেউ ভাল করে দেখিওনি। আমি ও আমার অন্য সহোদর ভাই যখন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং-এ, বুলগানীন তখন আমাদের জেলা শহরে সফল গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ওর মৃত্যু সংবাদ দার্জিলিং-এর কার্সিয়াং ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনিংরত অবস্থায় জানতে পারলাম। আমাদের কাউকে না জানিয়ে সবার আগে গেরিলা ট্রেনিং শেষ করেছিল আমার ভাই ‘‘বুলগানীন’’। সবচেয়ে ছোট বিধায় আমরা ওকে মায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, ‘‘মা’’-কে

ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

বুলগানীনের বয়স যখন পাঁচ, আব্বা চলে গেলেন পরপারে। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে আমাদের আদরের ছোট ভাইটি কখন যেন অনাদরে বড় হোয়ে গিয়েছিল।

বুলগানীন যখন পৃথিবীতে এলো, দু'বছর বয়স যেন মায়ের গর্ভেই কাটিয়ে এলো। বিরাট শিশু। "মা", বড়বোন, খালা, প্রতিবেশী কেউই বেশীক্ষণ তাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। বুলগানীন যখন বিছানায় দুপ্‌দাপ্‌ করে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলতো, আমরা ছোটরা শুধু তখনই তাকে আদর করতাম। আদরের বিনিময়ে খেতাম ওর ছোট অথচ মোটা মোটা হাত-পায়ের কিক-বক্সিং। প্রায় প্রতিদিনই ওর শক্তিশালী শিশু হাত দিয়ে আমাদের নাক-কান মুচড়িয়ে দিয়েছে। ওর ছোট হাত-পায়ের মার খেয়ে ব্যথা পেয়ে আমরা হাসতাম। আর ওটা ছিল আমাদের পারিবারিক বিশেষ আনন্দ। ছ'মাস বয়সে হরলিক্‌স্‌ শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতায় বুলগানীন প্রথম পুরষ্কার পেয়েছিল। রাশিয়ার এক জাঁদরেল সেনা কর্মকর্তার নামানুসারে আব্বা ওর নাম রেখেছিলেন। আজও আমার কানে স্পষ্ট বাজে হরলিক্‌স্‌ প্রতিযোগিতায় ঘোষিকা "প্রথম হোয়েছে মার্শাল বুলগানীন" বলে ঘোষণা করেছিলেন। কার্যতঃ বুলগানীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও দুরন্তপনা, তেজী ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশ পেত ওই সেনা কর্মকর্তার মতই। এ জন্য ৬/৭ বছর বয়সে আমাকে, ওকে পড়াশোনার জন্য শাস্তিমূলক শাসন করতে হয়েছে। আজো প্রতিদিন আমার সে সব কথা মনে পড়ে আর চোখের জল ফেলি।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন কিশোর সাহসী যোদ্ধাকে পাকি-রাজাকার-আলবদররা কয়েকদিন ধরে অমানুষিক অত্যাচার করার পর স্বাধীনতাবিরোধী নক্সাল্পন্থীদের হাতে তুলে দেয়। কয়েকজন বৃদ্ধ পাড়া-প্রতিবেশী বুলগানীনের শুধু দেহবিহীন মস্তকটি দাফন করেছিলেন শবে বরাতের পরের দিন। (চলবে)

মিঃ রঃ তরুনের ধারাবাহিক লেখা 'অসমাপ্ত',এর লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন